Through knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah (IOM)

Bachelor in Dawah & Islamic Studies

রিসার্চের বিষয়ঃ

পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করব।

ত্বত্তাবধায়নেঃ

আলী হাসান উস্তায

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান আইরিন

রোলঃ 21500607

তারিখঃ 04/12/2023

Through knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah (IOM)

Bachelor in Dawah & Islamic Studies

রিসার্চের বিষয়ঃ

পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করব।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

ত্বত্তাবধায়নেঃ

আলী হাসান উস্তায

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান আইরিন

রোলঃ 21500607

Through knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah (IOM)

Bachelor in Dawah & Islamic Studies

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "**পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করব**" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান আইরিন, আইডিঃ 21500607 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

স্বাক্ষর

.....

ত্বত্তাবধায়নেঃ

আলী হাসান উস্তায

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

স্বাক্ষর

.....

এক্সটারনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে,"**পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করব**" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

আইরিন

.....

ইসরাত জাহান আইরিন
21500607
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

তারিখঃ 04/12/2023

ভূমিকা

আগামী প্রজন্মকে রক্ষা এই প্রজন্মেরই অন্যতম দায়িত্ব নয় কি! আধুনিকতার নাম দিয়ে যারা প্রতি সেকেন্ডে নোংরামি চালিয়ে যাচ্ছে তাদের এই নোংরামি যেন আমাদের মাঝে না ছড়াতে পারে, উল্টো আমরা তাদের মাঝে ইসলামের শান্তির বাতাস এগিয়ে দিতে পারি সেই লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে।

প্রগতি ও আধুনিকতার নামে ইসলাম বিরোধী বিশ্বাস ও চরিত্র ধ্বংসের যে ভয়াবহ ফিতনা পৃথিবীকে গ্রাস করছে, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে মূর্খতা ও পশ্চাৎপদতা। কিন্তু আধুনিক এই সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য, বঞ্চনা, মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে।

যাদের দ্বারা এগিয়ে যাবে সামনের এই পৃথিবী তাদেরকে শক্তপোক্ত করে গড়ে তুলতে হবে, কোনো অবস্থাতেই তার দ্বীনের খুটিকে সামান্যতম হেলাতে সক্ষম না হয়। কাল থেকে কাল এগিয়ে চলেছে কিন্তু ইসলাম যেমন ছিল, তেমন আছে, আর এমনই চলতে থাকবে। ইসলাম তো সকল যুগের, সকল মানুষের জন্য সম্পূর্ন জীবনব্যবস্থা। আধুনিকতার নামে যারা এই সত্যকে গোপন করতে চায় তাদের নিয়তে বিশাল কোনো ব্যাপার রয়েছে। কেউবা ইহুদি-নাসারাদের দালাল, আর কেউবা মন মত না চলতে পারার ক্ষোভের সাগরে ডুবে আছে।

মূর্খতা! এতো চরম মূর্খতা!!

এই চরম মূর্খতা যেন আমাদের সন্তানদের আসে পাশেও না আসতে পারে তার জন্য এখনই সময় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া।

সূচিপত্র

১. দ্বীনের সঠিক পরিচয়দান … … … … … … … 07
২. কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করানো … … … … … 09
৩. সুন্নাহ্ই যে সর্বোত্তম আধুনিকতা … … … … … … 11
৪. সাহাবাওয়ালা জীবন গঠন … … … … … … … 13
৫. খারাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় জানানো … … … 15
৬. পোশাকের সঠিক জ্ঞান কী? … … … … … … … 20
৭. মোবাইলের নেশা থেকে রক্ষা করা … … … … … … 24
৮. ইন্টারনেটের ভয়াল থাবা থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা … 25
৯. সঠিক কাজে ব্যস্ত রাখা … … … … … … … … 27
১০. ইসলামী বিনোদন ব্যবস্থা … … … … … … … 29
১১. সবরের শিক্ষাদান … … … … … … … … 31
১২. সঠিক পরিবেশের ব্যবস্থা করা … … … … … … 33
১৩. বই পড়ার অভ্যাস গঠন … … … … … … … 34
১৪. আত্মীয়তার সঠিক মূল্যবোধ … … … … … … … 35
১৫. পশ্চিমাদের সঠিক পরিচয় দান … … … … … … 37
১৬. পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে রক্ষা করা … … … … … … 39
১৭. দ্বীনের সাথে নো কম্প্রোমাইজ … … … … … … 41
১৮. পারিবারিক তালিম … … … … … … … … 43
১৯. সঠিক মোহবতদান … … … … … … … … 45
২০. শিশুর সাথে বন্ধুসুলভ হওয়া … … … … … … … 47

রেফারেন্স (অধ্যায়ানুসারে) … … … … … … … … 49-50

১. দ্বীনের সঠিক পরিচয়দান

"দ্বীন" ব্যাপক একটি বিষয় তবে দ্বীন বলতে সাধারণ অর্থে বলা যেতে পারে একজন মানুষের সঠিক জীবন ব্যবস্থা। একজন মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ অব্দি সকল বিষয়ের সঠিক নির্দেশনা হলো দ্বীন। আমরা মানুষ, আমাদের জন্য হাজারো রাস্তা রয়েছে। কিন্তু এই প্রত্যেকটি রাস্তা যাচাই করে তারপর বাছাই করার এতো লম্বা সুযোগ আমাদের নেই। আর একবার কোনো রাস্তায় ফেলে আবার সেটা রিসেট করার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু আমাদের জন্য রয়েছে আমাদের সৃষ্টিকর্তার দেখানো পথ। ইসলাম! আর এটাই আমাদের দ্বীন।
"দ্বীন" শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। কুরআন মজীদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন স্থানে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা পূর্ণ বাক্য থেকে বুঝা যাবে। যে বাক্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐ শব্দের অর্থ সঠিকভাবে বুঝার উপায় নেই। কুরআনে "দ্বীন" শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছেঃ

- প্রতিদান, প্রতিফল, বিনিময় ইত্যাদি।
- আনুগত্য বা হুকুম মেনে চলা।
- আনুগত্য করার বিধান বা আনুগত্যের নিয়ম (যা ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত)।

আল্লাহর সত্য বাণী সম্বলিত কুরআনের কয়েকটি আয়াত থেকে দ্বীন শব্দের এসব অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। যখন ইসলামের সাথে "দ্বীন" শব্দটি ব্যবহৃত হবে তখন বুঝতে হবে দ্বীনের অর্থ হবে আনুগত্যের বিধান বা (ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত) জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আনুগত্যের বিধান বা জীবন ব্যবস্থা)।" (সুরা আলে ইমরান, ৩/১৯)

শিশুকাল থেকেই দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক শিক্ষা দিতে হবে। এতে করে পাকাপোক্ত অবস্থান তৈরি হবে শিশুর মনে। বর্তমান সময় এসেও দেখা যায় বড়রাই দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখে না। যেমন, অনেকে মুসলমানই বলে বসেন ঈসা নবী, মুসা নবী তো খ্রিস্টান, ইহুদিদের নবী ছিলেন। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো মুসলমানদের নবী। এগুলো আসলে অজ্ঞতার জন্য। না আমরা দ্বীনকে চিনি, না চিনতে চাই। পার্থিব জীবনের স্বার্থ হাসিলেই আমরা ব্যস্ত। আল্লাহ্ কুরআনে সরাসরি পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে প্রত্যেকেই এসেছেন ইসলাম নামক দ্বীনকে কায়েম করতে।

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; জার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ.) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি (আল্লাহ্) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মুসা ও

ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম টা হলো, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [সুরা শু'রা, ৪২/ ১৩]

আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীনের বিপরীত মুখী এক অবস্থান হলো **সেক্যুলারিজম**। ইচ্ছেমত জীবনকে পরিচালনা করার এক ব্যবস্থাও বলা যায়। এটি একটি ধর্মহীন মতবাদ। এর চলন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ধর্মহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। ধর্মীয় জীবনব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা ও ছুড়ে ফেলা। এই নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শের মোকাবিলা করতে বিভিন্ন ধর্মগুলোকে বহু কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। তবে একমাত্র ইসলাম এই মতাদর্শের সাথে কম্প্রোমাইজ না করে নিজের স্বকীয়তা নিয়ে টিকে রয়েছে। এই ধর্মহীন মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেই দীন হিসাবে পৃথিবীতে এগিয়ে চলেছে। কারণ, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক ধর্মমাত্র নয়। কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়; ইসলাম হলো আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দ্বীন।

ইসলাম মানুষের জীবনের সবদিক নিয়ে নির্দেশনা দেয়। যে ইসলামে বিশ্বাসী সে জীবনব্যস্থা হিসাবে ইসলামী শরীয়তে বিশ্বাসী হতে বাধ্য। নিছক ধর্ম পরিচয়ে মুসলিম হয়ে জীবনের বহুদিক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান মতো চলে প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ওহে যারা ঈমান এনেছো, 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা বাকারাঃ ২০৮)।

সেক্যুলারিজম নামক এই শয়তানের সৃষ্ট ভয়াল থাবা থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সাবধান করতে হবে। সঠিক দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে।

মূল শিক্ষাঃ

- ❖ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত মানেই দ্বীন ইসলাম নয়। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
- ❖ অধুনিকতার নামে সেকুলারিজমের দ্বারা শুধু অবক্ষয়ই সম্ভব।
- ❖ পার্থিব স্বার্থ হাসিলের দ্বারা আসলে কিছুই উপার্জন হয় না, দ্বীনের রাস্তায় চলার দ্বারা পার্থিব ও আখিরাতের কামিয়াবী পাওয়া যায়।
- ❖ চলার পথে রাস্তা সর্বদা একটাই থাকে না, দ্বীনের দ্বারা জীবন রেখা অঙ্কন করতে হবে।

২. কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করানো

পৃথিবীর সবথেকে মূল্যবান কিতাবের সান্নিধ্যে কে না আসতে চায়, কিন্তু এই কিতাবের সাথে তো শিশুদের সম্পর্ক এমনি এমনিতেই হবে না। এই দায়িত্ব আমাদের। প্রতিটি অভিভাবকের কর্তব্য ও দায়িত্ব যে, তার সন্তানকে শিশুবেলাতেই কুরআনের বাণী শিখানো। তাদের কথা বলা যেন শুরু হয় কুরআনের আলোকে। কুরআনের সম্পর্কে তাদের আগ্রহ তৈরি করার সাম্যক চেষ্টা চালানোর কাজ অভিভাবকেরই।

শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমেই অনুসরণ করে। পিতামাতার মাধ্যমেই শুরু হয় নতুন প্রজন্মের শিক্ষা যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। পরিবারই প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। তাই বাবা-মায়ের উচিত সবসময় নিজেকে কুরআনের সাথে জড়িয়ে রাখা। বাচ্চা যখন দেখবে তারা বাবা-মা নিয়মিত একটি কিতাবের মাঝে তাদের সময় দিচ্ছেন। সেখান থেকেই তাদের আগ্রহ তৈরি হবে।

উসমান (রাঃ) দ্বারা বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন,
তোমাদের (মুসলিম) মধ্যে সেই বেশি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শেখায়।

আর নিজের সন্তানকে কুরআনের শিক্ষাদান তো আরো উত্তম বিষয়।

সন্তানকে কুরআনের শিক্ষাদানের কতিপয় পদ্ধতিঃ

- **আল্লাহর কাছে চাওয়া।**

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া অনেক বড় রহমত। আল্লাহর কাছে নিজ সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দোয়া করা যেন তারা কুরআনকে তাদের অন্তরে আঁকড়ে রাখতে পারে। তাহাজ্জুদের দোয়ায় আল্লাহর কাছে চাওয়া। মনে রাখবেন, মা-বাবা হিসেবে সন্তানের দেখাশুনা করা আপনার কর্তব্য। আর এটাও খেয়াল রাখুন, আপনার সন্তানেরাও যেনো সবকিছু আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে।

- **ঘরে বেশি বেশি কুরআন পাঠ করা।**

শিশু জন্মের আগে থেকেই এটা শুরু করুন। অন্তঃসত্ত্বা থাকা অবস্থায় নিজে তিলাওয়াত করুন এবং বেশি বেশি তিলাওয়াত শুনার অভ্যাস করা। যখন আপনার শিশুরা ধীরে ধীরে বড় হবে, প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য তাদের সামনে কুরআনের অডিও তিলাওয়াত ছেড়ে দিন। শিশুদের সাথে কুরআনকে পরিচিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে কুরআন মুখস্থ করার প্রতি নয় বরং অভ্যস্ত করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

- **তাফসীরের থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিবারের সকলে মিলে আলাপ করা।**

প্রতিদিন কুরআন শোনানোর পাশাপাশি তার সাথে আয়াত বা সূরাটির অর্থ নিয়ে আলোচনা করুন। তার ওপর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা, শানে নূযূল চাপিয়ে দিতে যাবেন না। তার মনোযোগ আর আগ্রহ ধরে রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলুন।

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার (রাসূল সাঃ) প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেনো তা অনুধাবন করে।
[সূরা ছোয়াদ (৩৮)ঃ ২৯]

- **প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান।**

শিশুরা প্রশংসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তাদের অল্প কাজেও উৎসাহ প্রদান করে নতুন সবক দান করা। নিত্য নতুন উদাহরণের মাধ্যমে তাদের জানানো এবং তাদের থেকে সেগুলো শুনা।

দিনশেষে, যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। যে কোনো কিছুর ফলাফল কেবল মাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আমরা প্রত্যেকেই জান্নাতে আমাদের সন্তানদের সাথে মিলিত হতে চাই। এজন্য ভালো কাজের জন্য চেষ্টা করতে থাকুন এবং সন্তানদেরকেও সেটা করতে সাহায্য করা ইন শা আল্লাহ।

সচরাচর মুসলমানেরা তাদের শিশুদের ছোটবেলা থেকেই শুধু জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখান কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা, দয়া এবং সমবেদনা অথবা জান্নাতের সৌন্দর্যের কথা সেভাবে তুলে ধরেন না। আমরা শিশুদেরকে ভয় যতটা জোর দিয়ে দেখাই যে তারা যদি আল্লাহর অমান্য করে, মা-বাবার কথা নাশুনে, বা পাপ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের দোজখের আগুনে জ্বালানো হবে; ততটা তাদেরকে আশাবাদ দেই না যে তারা যদি সৎ কাজ করে, আল্লাহ ও মা-বাবাকে মান্য করে এবং কোনো ভালো কাজ করে তবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

সাধারণত কুরআনের শেষ অধ্যায় থেকে (ত্রিশ পারা) শিশুদের পড়ানো শুরু করে। এই অধ্যায় ছোট ছোট সূরা সম্বলিত যেগুলো ওহী আসার প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় নাযিল হয়। মূলত কুরাইশ গোত্রের বিপথগামী, অহংকারী এবং অত্যাচারী পৌত্তলিক নেতাদের (আবু জেহেল, আবু লাহাব) উদ্দেশ্যে এই সূরা গুলো নাযিল হয়েছিলো। তাছাড়া যারা মুসলমানদের অত্যাচার করছিলো, মুসলমানদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে হত্যা করেছিলো, নবীজী (সাঃ)কে হত্যার পরিকল্পনা করছিলো এবং বিশ্বাসীদের ধ্বংস করতে যুদ্ধ বাধিয়ে ছিলো-কুরআন নাযিলের সূচনার অধ্যায়গুলো মুলত তাদের উদ্দেশ্যেই।এটা খুবই দুঃখজনক যে এসব কঠিন বার্তা কোমলমতি শিশুদের উদ্দ্যেশে নাযিল না হলেও এগুলোই শিশুদের সর্বপ্রথম শিখানো হয়। হ্যা, প্রথমেই এ সূরাগুলো শিখানোর একটা কারণ হচ্ছে এগুলো ছোট এবং সহজে মুখস্ত করা যায়।

কিন্তু আমাদের উচিৎ পরবর্তী প্রজন্মকে বয়সানুসারে সাজিয়ে সাজিয়ে কুরআনের সাথে সম্পর্ক করানো।

৩. সুন্নাহ্ই যে সর্বোত্তম আধুনিকতা

কোনো বস্তুর ম্যানুফ্যাকচারার থেকেই আমরা তার ব্যবহারবিধি বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে থাকি। অথচ আমরা নিজেদের বেলায় এই নিয়ম মানতে অনেকেই টালবাহানা করে থাকি। সাময়িক সুবিধার কথা ভেবে প্রকৃত সঠিক রাস্তা রেখে যে আধুনিক সমাজ আমরা তৈরির চেষ্টায় থাকি টা আসলে মরীচিকা ছাড়া কিছুই না। এই মরীচিকার ধোঁকায় যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম না পড়ে তাই তাদের সাথে পরিচয় করানো উচিৎ সুন্নাহর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে সুন্নাহ বলা হয়। আর রাসূলকে তো আল্লাহই শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের ম্যানুফ্যাকচারার বা সৃষ্ঠিকর্তা থেকে কে ভালো জানে আমাদের জন্য কোন রাস্তা সঠিক কোনটি ভুল।

ইসলাম শুধু একটি ধর্মের নাম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যেখানে জীবন গঠনের সবচেয়ে সুন্দর পন্থা রয়েছে। ইসলামের মৌলিক সব বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। কিভাবে জীবন গঠন করলে ইহ ও পরকালে মুক্তি মিলবে তার বিধানও দেয়া আছে। মুসলমানের পরিচয় তার কর্মে। কর্মে যথাযথভাবে ইসলামকে অনুসরণ করতে না পারলে নিজেকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়ার সুযোগ নেই। সে জন্য কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠন করার মধ্যেই রয়েছে চরম সার্থকতা।
সুন্নাত মানে আদর্শ। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান আদর্শই সুন্নাত নামে পরিচিত। তিনি সর্বকালের সব মানুষের সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

‘অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত।’ (সুরা-৬৮ কলম, আয়াতঃ ৪)।

সুন্নাতের কথা যখন আসে, ফরজ ও ওয়াজিব তার আগেই থাকে। ফরজ ও ওয়াজিব পরিত্যাগ করে সুন্নাত পালনের দাবি অসার। সৎ উপার্জন, হালাল খাবার ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। নবীজি (সা.)–এর জীবন, দর্শন ও কর্ম যে যতটুকু অনুসরণ করবে, সে ততটুকু সফলতা ও কল্যাণ লাভ করবে। শান্তি ও নিরাপত্তায় সুন্নাত অনুসরণের বিকল্প নেই।

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রাসুলে কারিম রাসুলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তা ধারণ করো আর তিনি যা বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাকো। -সুরা হাশর, আয়াতঃ ৭

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুদের হাতেই নির্মিত হবে আমাদের আগামীর দিনগুলো
শিশুদের মেধার সুষ্ঠু বিকাশ ও নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাতে সবচেয়ে জরুরী তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। শিশুদের আদর্শ জীবন গড়ার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও স্বার্থক

পাথেয় রয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডারে।

আধুনিকতার সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা হলো সুন্নাহ। সুন্নাহ আমাদের দিকনির্দেশনা দেয় সুস্থ সুন্দর সাবলীল জীবনের। সাময়িক কোনো পরিবেশ, অবস্থা বা সময়ের জন্য যে কাজ এই সমাজে আমরা দেখি তা আসলে অধুনিকতা না। আধুনিকতা সেটাই যা দীর্ঘস্থায়ী সর্বদা চিরসত্য। আর তা একমাত্র বিদ্যমান আছে সুন্নাহ্-এর মাঝেই।

৪. সাহাবাওয়ালা জীবন গঠন

যুগে যুগে আসা শত শত কোটি মানুষের মাঝে শ্রেষ্টতম রাসূলের উম্মত হলেন সাহাবাগণ। তাদের সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা অতীব দরকার। সঠিক পথে চলার জন্য অনুসরণীয় ব্যাক্তিত্ব হলেন সাহাবা। মেসি, রোনালদো, শাহরুখ কখনো একজন মুসলমানের অনুসরণীয় হতে পারে না। কিন্তু এই দোষ শুধু পরবর্তী প্রজন্মকে দিলেই হবে না। সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কে আমরা তাদের আগ্রহ তৈরি করতে অনেকাংশই ব্যর্থ। "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তার বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের। " (সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ২৯)

কোন কোন সাহাবীর জীবদ্দশায় মুহাম্মদ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকে সাহাবীদের সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাজার "আল-ইসাবা" গ্রন্থে স্পেনের ইমাম ইবন হাযামের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, "সাহাবীদের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।"

কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদিসে সাহাবীদের মর্যাদা ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে সূরা আল ফাত্হ-১৮, সূরা আল ওয়াকিয়া-১০, এবং সূরা আল আনফালের ৬৪ সংখ্যক আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা এসেছে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ নিজেও তার সাহাবীদের শানে বক্তব্য রেখেছেন। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ বলেছেনঃ

"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা্ তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে।"

সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কিরামের অশেষ মর্যাদা ঘোষণার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে, গোত্রকেন্দ্রিক ও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রসুল। সাহাবিদের পরে তাবেয়ি থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যত অলি, বুজুর্গ পৃথিবীতে এসেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ আসবে কেউই একজন সাধারণ সাহাবির সমতুল্য হতে পারবে না। এ মর্মে ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের গালি দিও না। কেননা এক

মুহূর্তের জন্য যিনি রসুলের সুহবতে ধন্য হয়েছেন তাঁর আমল তোমাদের সারা জীবনের আমল থেকে শ্রেষ্ঠ।' ইবনে মাজাহ।

বনী ইসরাঈল ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। সেগুলোর মধ্য হতে একটি ফিরকা ব্যতীত অবশিষ্ট ৭২ ফিরকা জাহান্নামী হবে। সাহাবা (রাযিঃ) প্রশ্ন করলেন উক্ত নাজাত প্রাপ্ত ফিরকাভুক্ত কারা হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- "আমি এবং আমার সাহাবগণ যে তরীকার উপর, সেই তরীকার উপর যারা অটল থাকবে তারাই নাজাতপ্রাপ্ত দল। [তিরমিযী ২:৯৩]

করণীয়ঃ

- ⊙ বাসায় সাহাবীদের জীবনী বিষয়ক বই রাখা।
- ⊙ নিজে পড়ে শুনানো এবং শিশুদের পড়তে দেওয়া। পরিবারের মাঝে জীবনী পড়ার অভ্যাস তৈরি করা।
- ⊙ তারা কি বুঝতে পারলো তা শুনতে চাওয়া।
- ⊙ তারা প্রতি সাহাবী সম্পর্কে জানার পর তাদের পুরস্কৃত করা।
- ⊙ সর্বোপরি নিজে ও পরিবারের সকলের মাঝে সাহাবীদের আদর্শের চল ঘটানো।

পরিশেষে বলা চলে, সাহাবাদের বিষয়ে আগ্রহ তৈরির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। ইসলামের জন্য তাদের আত্মত্যাগ, দুনিয়াতে থাকতেই তাদের পাওয়া জান্নাতের শান্তির বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

৫. খারাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় জানানো

পার্থিব এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আমরা কত কিছুই না করি। ভালো-মন্দ ভুলে গিয়ে নানান পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছি। অথচ একজন মুমিন মুত্তাকি ব্যক্তি পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাসে মত্ত না হয়ে আল্লাহতায়ালা এবং পরকালকে ভালবাসেন।

এজন্যই মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির চেষ্টায় তার ইবাদত ও পুণ্য কাজে রত থাকে। কেননা আল্লাহর ইবাদতের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।
আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি বেশি মনোযোগি হয়ে যাই। অথচ হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করল সে তার পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। আর যে ব্যক্তি পরকালকে মহব্বত করল সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। সুতরাং তোমরা অস্থায়ী বস্তুর ওপর চিরস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দাও। (মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকি, মিশকাত)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, তোমরা জেনে রেখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, চাকচিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র।

দুনিয়ার সবই প্রকৃতপক্ষে ক্ষণস্থায়ী
দুনিয়ার পাপীষ্ঠ লোকেরা পাপ কাজ করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যায়। তারা মনেই করে না পরকালের কথা, যার ফলে তারা যত প্রকার খারাবি আছে সবই করে যায় নির্ভয়ে। এরা খারাপ কাজ করেই ক্ষ্যান্ত হয় না বরং তারা পৃথিবীকে সারা জীবনের আবাসস্থল ভেবে এই পৃথিবীর মোহে আকৃষ্ট থাকে। দুনিয়াদাররা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে তো দূরের কথা, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে নিয়েও তামাশায় মেতেছে। তাদের কাছে পার্থিব জগতটাই সব, পরকাল নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নেই। অথচ তারা একবারের জন্যও ভাবে না যে, বিশ্বময় মহামারি করোনার কাছে সম্পদশালী দেশও আজ নিরূপায়।

দুনিয়া হচ্ছে পরকালের সঞ্চয় জমানোর স্থান
আমরা যত ভালো কাজ করবো পরকালে আমাদের পাল্লা ততই ভারী হবে।
হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, দুনিয়া পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। আর পরকাল সামনে চলে আসছে। (মানুষের অন্তরে) এ দু' টির প্রতিটিরই রয়েছে প্রবল আসক্তি। সুতরাং তোমরা পরকালের প্রতি আসক্ত হও। দুনিয়ায় আসক্ত হইও না। কারণ এখন (দুনিয়া) আমলের সময়; কিন্তু (কোনো) হিসাব নেই। আর আগামীকাল (পরকাল) হবে হিসাবের; সেখানে আমল করার (কোনো) সুযোগ নেই। (বোখারি)

হাদীসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেন,
إياكم ومُحَقَّراتِ الذنوب
তুমি ঐ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হবে।

তাই পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত না হয়ে পরকালের কথা স্মরণ করে যাবতীয় মন্দ কাজ পরিহার করি আর সৎপথে জীবন যাপন করার চেষ্টা করি।

হারাম আরবি শব্দ, যার অর্থ 'নিষিদ্ধ' বা অবৈধ। শরিয়তে হারাম হচ্ছে এমন জিনিস যা কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।ইসলামি শরিয়তে হারাম অনেক জিনিস রয়েছে যা আমরা জানি ও মানি। কিন্তু এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো হারাম জেনেও আমরা করতে দ্বিধা করি না।

অথচ হারাম কাজ জেনে বুঝে করা কবিরা গুনাহ। আর একটি কবিরা গুনাহ জাহান্নামে পৌঁছে দিতে সক্ষম। তবে আল্লাহ যাকে ক্ষমা করেন সেটা ভিন্ন কথা। এমন কতগুলো জিনিস নিয়েই আজকে কথা বলবো।

- **গান শোনাঃ**

গান শোনা কবিরা গুনাহ। কিন্তু আমরা অনেকে তা মানতেই রাজি না। কিন্তু বড় বড় আলেমগণ একে হারাম বলেই স্বাব্যস্ত করে থাকেন।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. জামে সগির গ্রন্থর ১৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন, হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত যেনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার থেকে মুক্ত থাকে।

- **মদ ও জুয়া খেলাঃ**

মদ ও জুয়া ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপগুলোর মধ্যে একটি। আল্লাহ ও তাঁর নবি সা. আমাদের মদ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

সুরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও।

কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পা য়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। (সুরা নিসা-৪৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।

আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। (সুরা বাকারা-২১৯)

- **নিজকে বা অন্যকে আঘাত করাঃ**

নিজের শরীরে- গায়ে আঘাত করা। দুঃ খ পেলে বা কষ্ট পেলে নিজের বুকে-মুখে আঘাত করা।
এটা সম্পূর্ণ হারাম। অন্যকে আঘাত করার ব্যাপারেও একই কথা। আল্লাহ বলেন,

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (সুরা নিসা-২৯)

- **সুদ খাওয়াঃ**

রিবা (সুদ) ইসলামে কখনোই অনুমোদিত নয়।কারণ এটি একটি পদ্ধতি যা দরিদ্রকে দরিদ্র ও ধনীকে আরো বেশি ধনী করে তোলে!

সূরা বাকারার ২৭৫-২৭৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'যারা সুদ খায় তারা জিনে ধরা পাগল ব্যক্তির মতো হাশরের মাঠে দাঁড়াবে। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ব্যবসা তো সুদের মতোই।

অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। প্রতিপালকের নির্দেশ আসার পর যে ব্যক্তি বিরত হয়েছে, সে পূর্বে যা নিয়েছে তা তারই থাকবে।

তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। কিন্তু এ নির্দেশের পরেও যারা সুদে জড়িত হবে তারা জাহান্নামে যাবে। তারা চিরকাল সেখানেই থাকবে।

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। কোনো অস্বীকারকারী পাপীকে তিনি পছন্দ করেন না।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক; তবে সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।

যদি না ছাড় তবে জেনে রাখ, এটা আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু তোমরা যদি তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা অত্যাচার করবে না, তোমরা অত্যাচারিত হবে না।'

❖ পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহারঃ

পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। তবে তা মহিলাদের জন্য জায়েয বা বৈধ। স্বর্ণ ব্যবহারে নারীদের কোনো সাওয়াব নাই। অনেকে মনে করে নারীদের গহনা ব্যবহার করলে সাওয়াব হয়।কিন্তু বিষয়টি এমন না।

আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম করলেও তা নারীদের জন্য বৈধ। তবে সাওয়াবের নয়। তবে তারা যদি শুধু মাত্র স্বামীকে খুশি করতে স্বর্ণ পরিধান করে তাহলে তা সাওয়াবের হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্যে বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম (সুরা যুখরূপ-১৮)

❖ হস্তমৈথুন হারামঃ

আজকের পৃথিবীতে ঘরে ঘরে ইন্টারনেট তাই মানুষও খুব সহজেই খারাপ দুনিয়ায় বিচরণ করতে সক্ষম হয়। তাই তাদের নৈতিক অবক্ষয় খুব দ্রুতই হচ্ছে।এ ক্ষেত্রে যারা যুবক তারা জড়িয়ে পড়ছে খরাপ কাজে।

জিনা ব্যবিচারে লিপ্ত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ হস্তমৈথুনের মত জঘণ্য কাজেও নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। অথচ ইসলামে তা জঘণ্য অপরাদ।হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমরা কতক যুবক ছিলাম, আর আমাদের কোন কিছু ছিল না।

এই হালতে আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ বলেন, হে যুব সম্প্রদায় তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাজত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা, সওম তার যৌনতাকে দমন করবে। (বোখারি-৫০৬৬)

❖ আল্লাহ নাম ছাড়া অন্য করো নামে পশু জবাই করাঃ

এমনকি যদি কোন মুসলিম আল্লাহ নাম বিসমিল্লাহ্ আল্লাহ ও আকবার না বলে একটি পশুকে হত্যা করে তবে তা হারাম হবে! তাই পশু জবাই করতে জবাইকারী বলবে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার।

❖ শরীরে ট্যাটু বানানোঃ

শরীরে ট্যাটু অঙ্কিত করা কোনভাবেই ইসলামে জায়েজ নেই। কঠোরভাবে ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদিস শরিফে রাসুল সা. এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

❖ **আত্মহত্যা করাঃ**

এই যুগে আমরা প্রায়শই মানুষকে আত্মহত্যা করতে দেখি। বিশেষদ তরুণদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক বেশি। আত্মহত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম।

❖ **স্ত্রী কে প্রহার করাঃ**

স্ত্রীকে কোনো কারণ ছাড়াই আঘাত করা মহাপাপ। কারণ আল্লাহ তায়ালা বিবাহ এক অর্পূর্ব
ভালোবাসার সেতুবন্ধন। ই তাকে ভারোবাসা দিয়ে আগলে রাখতে হবে। নারী জাতিকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষের পাজরের বাঁকা হাড় থেকে। তাই তাদের সঙ্গে নমনীয় আচরণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এই হারাম বিষয়গুলো জেনে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। পাশাপাশি নিজের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদেরও বিরত রাখার তাওফিক দিন। অঅমিন।

৬. পোশাকের সঠিক জ্ঞান কী?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়েও ইসলামের মৌলিক দিক নির্দেশনা রয়েছে।
পোশাক সম্পর্কে ইসলামে কিছু নীতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। আবার কিছু স্বতন্ত্র বিষয়ও রয়েছে। প্রথমে সাধারণ কিছু নীতি উল্লেখ করছি।

৬ সতর আবৃত করা

পোশাক এমন হতে হবে যা পুরোপুরি সতর আবৃত করে। পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আর নারীর পুরো শরীর সতর। পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্যই হল সতর ঢাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সৌন্দর্য দান করে।' (সূরা আ'রাফ ২৬)

সুতরাং যে পোশাক এই উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ তা যেন শরীয়তের দৃষ্টিতে পোশাকই নয়। তা নাজায়েয পোশাক। এটা পরিত্যাগ করে পূর্ণরূপে সতর আবৃত করে এমন পোশাক গ্রহণ করা জরুরি। যেমন পুরুষের জন্য হাফ প্যান্ট পরা। মহিলাদের পেট-পিঠ উন্মুক্ত থাকে এমন পোশাক পরিধান করা।

৬ অধিক পাতলা বা আঁটশাট না হওয়া

যে পোশাক পরিধানের পরও সতর দেখা যায় কিংবা সতরের আকৃতি পোশাকের উপরে ফুটে উঠে তা-ও সতর আবৃত না করার কারণে নাজায়েয পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের পোশাক পরিধান করা হারাম।

৬ বিধর্মীদের পোশাক না হওয়া

বিধর্মীদের অনুকরণে পোশাক পরিধান করা নাজায়েয। যেমন ইহুদী-খৃষ্টান পুরোহিতদের পোশাক। হিন্দুদের ধুতি-লেংটি, মাজার পূজারীদের লালশালু এবং শিয়াদের অনুকরণে পূর্ণ কালো পোশাক ইত্যাদি। হাদীস শরীফে এসেছে, 'নিশ্চয়ই এটি কাফেরদের পোশাক। তোমরা তা পরিধান করো না।' (সহীহ মুসলিম ৬/১৪৪; মুসতাদরাকে হাকেম ৪/১৯০)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি তাদের পোশাক পরবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (তবারানী আওসাত ৩৯২১; ফাতহুল বারী ১০/২৮৪)

৬ অহংকার-বড়ত্ব-রিয়া সৃষ্টিকারী পোশাক না হওয়া

এমন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যেগুলোকে শরীয়ত অহংকারীদের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছে এবং তা পরিধান করতে নিষেধ করেছে। যেমন পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার করা। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-আমার উম্মতের পুরুষের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে। আর মহিলাদের জন্য এগুলো হালাল করা হয়েছে। (জামে তিরমিযী ১/৩০২ হাদীস ২৭৯) তদ্রূপ টাখনু গিরার নিচে কাপড় পরিধান করা।

হযরত আবু জুরাই থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, টাখনু গিরার নিচে কাপড় পরিধান থেকে বিরত থাক। কেননা এটা অহংকারবশত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা অহংকারীকে ভালবাসেন না। (সুনানে আবু দাউদ ২/৫৬৪ হাদীস ২৭৫; মুসনাদে আহমদ ৫/৬৩ হাদীস ২৪১৯)

৬ প্রসিদ্ধির পোশাক না হওয়া

মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি পাওয়ার লক্ষ্যে পোশাক নির্বাচন করা, পোশাকের ভিন্নতা ও চাকচিক্য এজন্য বেছে নেওয়া যেন লোকসমাজে সে প্রসিদ্ধি পায়। এককথায় মানুষের নিকট আলোচিত ও প্রসিদ্ধ হওয়ার নিয়তে পোশাক গ্রহণ করা জায়েয নয়। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে কঠিন ধমকি এসেছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির পোশাক পরবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন। অতঃপর তাকে অগ্নিদগ্ধ করা হবে। (সুনানে আবু দাউদ ৪০২৯; আততারগীব ৩/১১২)

৬ পুরুষের পোশাকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

ক) নারীর পোশাক বা নারীর পোশকের মতো পোশাক না হওয়া।

হাদীস শরীফে এসেছে-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ঐ পুরুষকে যে মহিলার পোশাক পরে এবং ঐ মহিলাকে যে পুরুষের পোশাক পরে। (সুনানে আবু দাউদ ৪০৯৮; মুসনাদে আহমদ ২/৩২৫)

সুতরাং পুরুষের জন্য মেয়েদের পোশাক পরিধান করা হারাম।

খ) রেশমের কাপড় পরিধান না করা। কেননা রেশমের কাপড় পুরুষের জন্য হারাম।

গ) জাফরানী রংয়ের কাপড় না হওয়া। এটা পুরুষের জন্য নাজায়েয।

ঘ) কুসুম রং কিংবা গাঢ় লাল রং না হওয়া। কেননা কুসুম রং মাকরূহ তাহরীমী। আর লাল রং মাকরূহ।

↳ নারীর পোশাকের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

ক) পুরুষের পোশাক বা পুরুষের সদৃশ পোশাক না হওয়া। হাদীস শরীফে এসেছে, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন ঐ মহিলা, যে পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।'

নারীর জন্য পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করা হারাম। কিন্তু আজকাল এটি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। মেয়েরাও প্যান্ট-শার্ট পরছে!

খ) পুরো শরীর ঢাকা পোশাক হওয়া।

মহিলাদের পোশাক এমন হওয়া চাই যাতে গোটা দেহ আবৃত থাকে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই এমন এমন স্টাইলের পোশাক বের হচ্ছে যাতে শরীরের বিভিন্ন অংশ খোলা থাকে। অর্থাৎ সতর আবৃত করার পরিবর্তে তা আরো প্রকাশিত করে তোলাই যেন পোশাকের উদ্দেশ্য। যেমন শাড়ি, নারীর জন্য ওড়না ছাড়া দুই পোশাক প্যান্ট-শার্ট বা প্যান্ট-গেঞ্জি। এগুলো ফ্যাশনের নামে নোংরামি। এ ধরনের ফ্যাশনে গা ভাসিয়ে দেওয়া স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদা বোধ না থাকারই দলীল। অনেক বিধর্মীও এমন রয়েছে যারা শালীন পোশাক পরিধান করে। ফ্যাশনের নামে যেসব কুরুচিপূর্ণ পোশাক তৈরি করা হয় তা তারা পরিহার করে চলে। অথচ আমাদের ধর্মে এত সুন্দর দিক-নির্দেশনা থাকার পরও ওইসব অশালীন ফ্যাশনের অনুগামী হয়ে যাওয়া কি দুঃখজনক নয়?

বর্তমান সময়ের কিছু পোশাক বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

⊙ পুরুষের জন্য প্যান্ট-শার্ট

প্রথমে এটি ইংরেজদের পোশাক থাকলেও এখন তাদের বিশেষ পোশাক থাকেনি। তাই বিজাতীয় অনুকরণের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই পোশাক পরবে তার জন্য নাজায়েয হবে। কিন্তু যদি তাদের অনুকরণের নিয়ত না থাকে তবে তার ক্ষেত্রে এই পোশাক পরলে বিজাতীয় পোশাক পরার গুনাহ হবে না বটে, কিন্তু এরপরও কিছু কারণে এটি অবৈধ পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-১. টাখনু গিরার নিচে হওয়া। ২. স্কিন টাইট অর্থাৎ এত আঁটশাট হওয়া যে, সতরের আকৃতি কাপড়ের উপর ফুটে উঠে। হ্যাঁ, প্যান্ট-শার্ট যদি উপরোক্ত খারাবী থেকে মুক্ত হয় এবং বিজাতীয় অনুকরণের উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে তা পরিধান করা নাজায়েয হবে না। অবশ্য এরপরও তা পরিধান করা মাকরূহ এবং তা ব্যবহার নাক করাই বাঞ্ছনীয়।-দরসে তিরমিযী ৫/৩৩২; ইসলাহী খুতবাত ৫/২৭৮, ফাতাওয়া নিযামিয়া ১/৪২৩; কেফায়াতুল মুফতী ৯/১৬৮; আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৬৪

⊙ টাই

টাই যদিও আজকাল মিশ্র পোশাকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এর সূচনা ইহুদীদের শূলের প্রতীক হিসাবে হয়েছে বলে বেশ জনশ্রুতি আছে। যেহেতু এ বিষয়টি তথ্যপ্রমাণপুষ্ট নয় আর মিশ্র পোশাক হিসাবেও এর প্রচলন হয়ে পড়েছে তাই মুফতীগণ বলেন, এটা পরা একেবারে নাজায়েয তো হবে না; বরং মাকরূহ হবে। তাই এর ব্যবহার এড়িয়ে চলা কর্তব্য। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১২/৪০৮)

⊙ মহিলাদের শাড়ি

শাড়ি একসময় হিন্দু নারীর পোশাক ছিল, কিন্তু এখন আর তাদের বিশেষ পোশাক থাকেনি। এখন এটা মিশ্র পোশাকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং শাড়ি পরলে এবং অনুকরণের নিয়ত না করলে বিধর্মীদের সাদৃশ্যের গুনাহ হবে না বটে কিন্তু যেহেতু শাড়ি পরিধান করলে সাধারণত শরীরের বিভিন্ন জায়গা খোলা থাকে যেমন-পেট, পিঠ, বুক হাতের বাহু ইত্যাদি, তাই এভাবে শাড়ি পরিধান করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি ব্লাউজ এমনভাবে বানায় যদ্দারা উপরোক্ত অংশগুলোও পুরোপুরি ঢেকে যায় এবং শাড়ির উপর থেকে পেট-পিঠ ও বুকের আকৃতি ফুটে না উঠে তাহলে তা পরিধান করা নাজায়েয নয়। (কেফায়াতুল মুফতী ৯/১৭০; আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল্ ৭/১৬৩)

⊙ শর্টকামিজ, ধুতি থ্রি-পিস

এগুলো অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় অনুকরণের অন্যতম দৃষ্টান্ত। শরীয়ত মেয়েদের সৌন্দর্য যথাসম্ভব ঢেকে থাকে এমন পোশাকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বিজাতীয় নীতি এর উল্টো। তারা চায় এমন পোশাক, যার দ্বারা নারীর সৌন্দর্য আরো প্রকাশ পায়। তাই কামিজ থেকে শর্টকামিজ এবং যতই দিন যাচ্ছে তা আরো ছোট হচ্ছে এবং আঁটশাট হচ্ছে। হাদীস শরীফে এসেছে-দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী। ১. ঐ সকল নারী, যারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও বিবস্ত্র থাকে ... তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।-সহীহ মুসলিম হাদীস ২১২৮

কিছুদিন আগে মেয়েদের ধুতি থ্রি-পিস বের হয়েছে। ছেলেদের জন্য বের হয়েছে ধুতি পাঞ্জাবি সেট। নিচের অংশ একেবারে ধুতির লেংটির আদলে সেলাই করা। হঠাৎ দেখলে হিন্দু বলে ভ্রম হতে পারে, আসলে তারা হিন্দু নয়, আমাদেরই মুসলিম ভাই-বোন!

বলা চলে, আধুনিকতার নামে কতিপয় ইসলামবিদ্বেষী মানুষরূপী কীটপতঙ্গ ছড়িয়ে দিতে চায় নোংরামি। সমাজকে তারা অসভ্য এক অবস্থানে নিয়ে যেতে উঠে পড়ে সর্বদা লেগেই থাকে। সভ্য-সামাজিক পোশাকের জ্ঞান দেয় কুরআন ও হাদীস থেকে। এগুলোই আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের পথে করে তুলতে পারে কল্যাণময়।

৭. মোবাইলের নেশা থেকে রক্ষা করা

প্রযুক্তির উচ্চতর আবিষ্কারগুলো আল্লাহর একান্ত রহমত ও তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য উদঘাটনে প্রযুক্তির নানা দিক ও আবিষ্কারগুলোই এর বড় দৃষ্টান্ত। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি অপব্যবহারের ফলে মানুষ নানান ধরনের অন্যায়-অপরাধ তথা অশ্লীলতায় নিয়োজিত হচ্ছে। যা উঠতি বয়মী কিশোর যুবক থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধদেরকেও অন্যায় অপরাধের দিকে অনেক বেশি ধাবিত করছে।

মোবাইল বর্তমান সমাজের সাথে একেবারে মিশে যাওয়া এক প্রযুক্তি। কোনো ব্যক্তিই বর্তমানে মোবাইল ছাড়া নেই বলা চলে। শিশু থেকে শুরু করে যুবক, মধ্যবয়স্ক, এমনকি বয়স্করাও মোবাইলের সাথে সম্পৃক্ত। এদের মাঝে বেশিরভাগই মোবাইলের নেশায় আসক্ত।

মোবাইল ও সমজাতীয় প্রযুক্তির নেশা থেকে পরিত্রাণের কতিপয় উপায় সমূহঃ

- সময়মত সালাত আদায় করা।
- পরিবারের সাথে সময় কাটানো।
- সারাক্ষণ ঘরকুনো না হয়ে প্রকৃতির মাঝে বেরাতে বের হওয়া।
- নিজের মধ্যে গুনাহ ছাড়ার অভ্যাস করা।
- সময় করে কুরআন পড়ার অভ্যাস তৈরি করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ উচ্চারণঃ ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ’মালি ওয়াল আহওয়ায়ি।’ অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।’ (তিরমিজি)

সুতরাং তথ্য প্রযুক্তিসহ দুনিয়ার যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকতে কুরআন-সুন্নাহর দিক-নির্দেশনা পালনের পাশাপাশি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দোয়া ও আমল অত্যন্ত জরুরি।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নিয়মিত নামাজ আদায়ের পাশাপাশি মিজদায় দোয়াটি বেশি বেশি পড়ার তাওফিক দান করুন। অশ্লীলতা ও বেহায়পনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরকে এই সকল প্রযুক্তির নেশা থেকে বাঁচতে শিখবে এবং জীবন গড়তে সহজ হবে।

৮. ইন্টারনেটের ভয়াল থাবা থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা

মানুষ অন্যান্য মাধ্যমের মতো ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে আসক্ত। ২১ শতকের শুরু থেকে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারের এক বিস্ফোরণ সূচিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী শতকোটিরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত। আজ থেকে ৪ বছর আগে তথা ২০১৪ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল আমেরিকায় প্রতিটি মানুষ মারা মাসে গড়ে ২৭ ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে সময় ব্যয় করে। আর মারা মাস হাতের মোবাইল ফোনের ওপর ব্যয় করে ৩৪ ঘণ্টা।

নিঃসন্দেহে এ কয়েক বছরে এ হার দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপকহারে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর নেতিবাচক বা খারাপ প্রভাবগুলো সামনে উঠে আসছে আরও স্পষ্টভাবে। এসব নেতিবাচক প্রভাব মানুষকে দৈহিক, মানসিক এবং আবেগের দিক দিয়ে চিরস্থায়ী ক্ষতি সাধন করছে। অতিরিক্ত ইন্টারনেটের ব্যবহার কী কী নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা বলতে গেলে, নিচের বিষয়গুলো আগে উঠে আসবে।

অনলাইনে সাইবার বুলিয়িংয়ের শিকার একজন ব্যক্তি খারাপ মন্তব্য বা মতামতের কারণে অপমানিত-অপদস্থ বোধ করেন। সাইবার বুলিয়িংয়ের শিকারে আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটে থাকে।

ইন্টারনেট এমন একটি গ্লোবাল মিস্টেম যেখানে এর ব্যবহারকারীদের কোনো শারীরিক বা কায়িক পরিশ্রম করার দরকার পড়ে না। তাই যে মানুষ বেশি সময় ইন্টারনেট ব্যবহার করে সে তুলনামূলকভাবে খেলাধুলা, ব্যায়ামের মতো শারীরিক কার্যক্রম কম করে থাকে। আর এভাবে ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে শারীরিক অক্ষমতার দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে মানুষ শারীরিকভাবে এক সময় দুর্বল প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাবে।

পড়ালেখাসহ বিভিন্ন কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গিয়ে জীবনের কোনো না কোনো সময় মানসিক সমস্যার শিকার হয়েছে ৮৫.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। তাদের এই মানসিক সমস্যার পেছনে ভূমিকা রেখেছে ইন্টারনেট।
সম্প্রতি এক হাজার ৭৭৩ জন শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য পেয়েছে আঁচল ফাউন্ডেশন।
জরিপে দেখা গেছে, ৩২.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি দেখে। পর্নোগ্রাফি দেখার পর এই কাজে আগ্রহ অনুভব করে ১৩.৬ শতাংশ, হীনমন্যতায় ভোগে ২৫.৫ শতাংশ, বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে ১৫.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী।

জরিপে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের ৯১ শতাংশ ইন্টারনেটে আসক্ত। এর মধ্যে খুব বেশি আসক্ত ২২.৪ শতাংশ, মোটামুটি আসক্ত ৪৭.৭ শতাংশ, অল্প আসক্ত ২০.৯ শতাংশ। ৮০.১ শতাংশ শিক্ষার্থী জানায়, পড়ালেখার সময় প্রচণ্ড আসক্তি জেগে ওঠে।

অপরিমিত ইন্টারনেট ব্যবহার করছে ৬২.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬.২ শতাংশ শিক্ষার্থী দিনে ১১ ঘণ্টার বেশি অনলাইনে থাকে। ১৯.৫ শতাংশ ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ৩৬.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা এবং ৩২.৩ শতাংশ দুই থেকে চার ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

তাই আমাদের ইন্টারনেটের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে এর ব্যবহার সীমিত করতে হবে।

পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষায় আমাদের করণীয়ঃ

- চাইল্ড ভার্সন অপশনটি ব্যবহার।
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় বেধে দেওয়া।
- নিজে কী দেখছি সে বিষয়েও সতর্ক হওয়া।
- শিশুর সাথে নিজেও অংশ নেওয়া।
- প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ই-মেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার।

৯. সঠিক কাজে ব্যস্ত রাখা

সব শিশুরাই কৌতূহলী হয়। কৌতূহল শিশুকে বিভিন্ন কিছু শিখতে আগ্রহী রাখে এবং নতুন, অনিশ্চিত বা চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলোকে আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন খেলা, খেলনা, পেইন্ট বা লেগোর মতো সৃজনশীল উপাদানের মাধ্যমে শিশুর কৌতূহল গড়ে তুলুন। বাবা-মা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমেও শিশুকে কৌতূহলী করে তুলতে পারেন।

বাসায় শিশু থাকলে আজকাল একটি কথা 'কমন' পড়তে পারে আপনারও। কিছুক্ষণ পরপর এসে বলবে সে 'বোর' হচ্ছে। আর তারপরের আবদারই থাকে মুঠোফোন ব্যবহারের। সারা দিন নাওয়াখাওয়া ফেলে গেম বা ভিডিও দেখেই পার হয়ে যাচ্ছে সময়। কিন্তু এই অভ্যাস একদম করা যাবে না।

শিশুদের বিকাশে সহায়ক এবং বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে এমন কয়েকটি কাজ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন ভারতীয় মনোরোগ **বিশেষজ্ঞ কাশিশ এ সাব্রিয়া এবং হেমন্ত মিত্তাল**।

* শিশুর ভিডিও গেইম খেলা, টেলিভিশন ও সিনেমা দেখা, ইন্টারনেট ব্যবহার ইত্যাদির উপর তদারকি করতে হবে। শিশুকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেওয়ার আগে সব ধরনের আপত্তিকর সাইটে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে।

* ভিডিও গেইম, টেলিভিশন কিংবা সিনেমা থেকে শিশু কী শিক্ষা গ্রহণ করছে সেদিকে নজর দিতে হবে। জেরা করে নয়, তাদের সঙ্গে কথা বলে কৌশলে এই বিষয়গুলো জানতে হবে।

* শিশুকে নিত্যনতুন কাজের সঙ্গে জড়ানোর সুযোগ করে দিতে হবে। এই কাজগুলো শিক্ষামূলক এবং মজাদার হওয়া জরুরি। যেমন, বাগান করা নিয়ে অসংখ্য গেইম আছে, সেগুলো খেলার উৎসাহ দিতে পারেন।

* শিশুকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ঘরের নিরাপদ পরিবেশে বদ্ধ না রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের বেড়াতে নিয়ে যান। এতে ইন্টারনেট জগতের বাইরের বাস্তব জগতের প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি হবে।

* পরিচ্ছন্নতার নামে শিশুকে মাটির স্পর্শ থেকে দূরে রাখা উচিত নয়। বিশেষ শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে কালেভদ্রে শিশুকে গ্যাজেটস ফেলে কাদামাটির নিয়ে খেলতে উৎসাহ দিন।

* শিশুর সঙ্গে বোঝাপড়া করার কৌশল রপ্ত করতে হবে। আপনার সন্তান যখন বাজারে নতুন আসা ট্যাব কিংবা মোবাইল ফোনের বায়না ধরবে তখন তার সঙ্গে জুড়ে দিন মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করা কিংবা গ্রামের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসার শর্ত।

* বৈদ্যুতিক গ্যাজেটসগুলো যাতে শিশু শোবার ঘরে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

* টেলিভিশন, সিনেমা, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদির লাগামহীন ব্যবহার রোধ করতে হবে। সময় বেঁধে দিতে হবে এবং তা শক্ত হাতে মেনে চলতে হবে, শিশুর জেদ কিংবা কান্নাকাটির কাছে হেরে যাওয়া চলবে না।

কিছু ভালো কাজের নমুনাঃ

- ছবি আঁকা বা ক্র্যাফটিং।
- বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করানো।
- রান্নাবান্নায় সাহায্য করার অভ্যাস করানো।
- মাথা খাটানোর মতো কিছু পাজল মেলানোর খেলা।
- মাঠে ও ঘরোয়া খেলাধুলার অভ্যাস করানো।

আপনার সন্তানকে খেলাচ্ছলে নিরীক্ষার দিকে উৎসাহিত করতে পারেন। বয়স বুঝে তাকে দূরবিন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা ছোট কোনো রিসাইকেল করা যায় এমন উপকরণ সরবরাহ করতে পারেন। এরপর সেসব কীভাবে কাজ করে, সেটা দেখিয়ে দিন। শিশুরা সাধারণত উদ্ভাবনী বিষয়গুলোতে উৎসুক হয়ে থাকে। এতে খেলাচ্ছলে সে পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানী বা উদ্ভাবনী কাজে আগ্রহী হতে পারে।

১০. ইসলামী বিনোদন ব্যবস্থা

নিষ্পাপ আনন্দ ও বৈধ বিনোদন সুন্নত। বিনোদনের উপায়-উপকরণগুলোর প্রায় সব কটিই প্রিয় নবীজি (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োগ ও উপভোগ করেছেন।

আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) কুস্তি লড়েছেন। তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকে তিনি তিন-তিনবার হারিয়েছেন। মদিনায় যুবকদের শারীরিক কসরত তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন। হজরত আয়েশাও (রা.) ঘরে বসে তা উপভোগ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিবি আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে একাধিকবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।

শৈশবে নবীজি (সা.) খেলাধুলায় নেতৃত্ব দিতেন। কৈশোরে হুজুরে পাক (সা.) প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন করতেন। তরুণ বয়সে তিনি তরুণ সংঘ গড়ে তোলেন। যুবক বয়সে তিনি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর রচিত কবিতা বুখারি শরিফসহ সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে উল্লেখ আছে। যেমন 'আনা নাবিউন লা কাযিব, আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব।' অর্থঃ আমি নবী মিথ্যা নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হই। (সিরাতে ইবনে হিশাম)।

আনন্দ-বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো সংগীত। প্রিয় নবীজি (সা.) প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা শরিফ থেকে হিজরত করে যখন মদিনায় গেলেন, তখন দীর্ঘ দুই সপ্তাহের অবিরাম সফরের ক্লান্তিতে মলিন বদনে এক উষালগ্নে যখন সেখানে পৌঁছান, তখন মদিনার ছোট্ট ছেলেমেয়েরা অভ্যর্থনাসংগীত গেয়ে প্রিয় নবীজি (সা.)-কে স্বাগত জানাল। তারই দুটি চরণ হলো 'তলাআল বাদরু আলাইনা মিন ছানিয়াতিল বেদায়ে, ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা মা দাআ লিল্লাহি দায়ি।' অর্থঃ সানিয়া বেদা হতে পূর্ণিমা শশী উদয় হলো আমাদের প্রতি; কৃতজ্ঞতা কর্তব্য আমাদের ডেকেছেন তিনি আল্লাহর প্রতি। (ইসলামি বিশ্বকোষ)।

কোরআন অর্থ পাঠ করা বা পাঠযোগ্য। কিরাআত ও তিলাওয়াত তথা আবৃত্তি ও পরিবেশনা নবীগণের (আ.) অন্যতম দায়িত্ব। কোরআনের প্রথম অবতীর্ণ শব্দটি হলো 'ইকরা' , মানে পড়ো। পড়া, পাঠ, শ্রবণ ও পড়ে শোনানো এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতা বিশেষ সুন্নত। কোরআন করিমের তিন আয়াতবিশিষ্ট সর্বকনিষ্ঠ সুরা 'আল কাউসার' অবতীর্ণ হওয়ার পর তা বিখ্যাত সাবআহ মুআল্লাকাহর (সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা) পাশে কাবাগাত্রে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা দেখে তখনকার আরবের প্রধান কবি লাবিদ মন্তব্য করেছিলেনঃ 'লাইছা হাজা মিন কালামিল বাশার' (ইহা মনুষ্য বাণী নহে)। অতঃপর লাবিদসহ অনেক কবি-সাহিত্যিক ইসলাম গ্রহণ করেন। (সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া)।

কতিপয় বিনোদন মাধ্যম নিম্নে উল্লেখ করা যায়।

- ❖ গল্প
- ❖ কৌতুক
- ❖ হাস্যরস
- ❖ খেলাধুলা
- ❖ কবিতা
- ❖ আবৃত্তি
- ❖ পদ্য প্রণয়ন
- ❖ গদ্যপাঠ
- ❖ সাহিত্যরচনা
- ❖ ইসলামি সংগীত ইত্যাদি।

তবে ইসলামি শরিয়তের প্রমাণিত বিধান লঙ্ঘন করে এমনভাবে আনন্দ-বিনোদনে লিপ্ত হওয়া গর্হিত কাজ। আল্লাহতায়ালা মানুষকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। খোদাপ্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মানুষ অনায়াসেই হালাল-হারামের মাঝে তফাত করতে পারে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, 'এক লোক হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ভালো ও মন্দ কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ভালো কাজ যা অন্তরকে স্বস্তি দেয় ও আত্মাকে প্রশান্ত করে। আর পাপ কাজ হলো যা অন্তরে কালো দাগ ফেলে দেয় এবং অন্তরে দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করে।' -মুসনাদে আহমদ : ১৮০৩০

বিনোদনের যেসব মাধ্যমের সাথে বিপরীত লিঙ্গের দিকে কামনার দৃষ্টি জড়িয়ে আছে, সেগুলো সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

বিনোদনমূলক ব্যবস্থা কোন মতেই ইসলামী শরীআতের মূলনীতির পরিপন্থি হতে পারবে না। বিনোদনের এ মূলনীতিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম যে সমস্ত কথা, কাজ আচার আচরণ ও তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা কখনো বিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এককথায়, এ ক্ষেত্রে শরীআতের মূলনীতির বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১১. সবরের শিক্ষাদান

আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দাদের এই দুনিয়াতে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করেন। আল্লাহর বান্দার উচ্চতা ততই উচুতে উঠতে থাকে যে ধৈর্য নিয়ে আল্লাহর দেখানো রাস্তায় চলতে পারে। সফলকাম হবার জন্য ধৈর্য এক অবশ্যম্ভাবী উপাদান।

হযরত আইয়ুব (আ.) এর জীবনী থেকেই এর অন্যতম শিক্ষা আমরা পাই। আল্লাহ্ তাকে কঠিন থেকে কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন। হযরত আইয়ূব (আ.) রোগাক্রান্ত হয়ে আস্তে আস্তে তিনি সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, বিশাল সম্পত্তিসহ সবকিছু হারান। এমনকি পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য শহরের বাইরে এক ছোট্ট কুটিরে আশ্রয় নেন। এই পরীক্ষার সময় একমাত্র স্ত্রী রাহিমাই ছিলেন তাঁর একমাত্র সঙ্গী। তিনি এই কঠিন সময়েও ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহ্ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। সূরা আম্বিয়াতেই এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

নবীগণ আল্লাহর সবথেকে কাছের বান্দা। আল্লাহ্ তাদের মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের জীবন থেকেই আমরা দেখতে পাই কীভাবে তারা ধৈর্য্যধারণ করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়েছেন এবং আল্লাহকে সর্বদা তারা তাদের সাথেই পেয়েছেন। বর্তমান প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরতে হবে আল্লাহর এই বাণী,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত-১৫৩)

আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন ধৈর্য হারা হবার কারণে কি হতে পারে। রাসূলের সীরাত থেকে আমরা পাই, সবর হারানোর ফলে উহুদ যুদ্ধে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মুখেও পড়তে হয় মুসলমান বাহিনীর। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) ও নবীজির চাচা হযরত হামজা (রা.) সহ অনেক মুসলমান শহীদ হন। তাই, ওহুদের প্রান্তরে নবীজির নির্দেশ উপেক্ষাকারী অধৈর্যশীলদের ভুলের মাশুল দিতে হয় গোটা মুসলিম বাহিনীকে। শহীদ হয় প্রিয় নবীজীর দাঁত মুবারক।

তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।
(সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াতঃ ২০০)।

আধুনিক এই যুগ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আধুনিক প্রজন্ম আরও দ্রুতগামী। কিন্তু দ্রুততা সকল ক্ষেত্রে কখনোই ভালো না। দ্রুত পাওয়া খ্যাতি কতজনের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আমাদের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর ধৈর্যের মাধ্যমে ধীরে সুস্থে পাওয়া খ্যাতি মানুষকে করে তোলে বিনয়ী, আল্লাহর প্রতি শোকরগুজার। আর আল্লাহ্ তাদের মাঝে দিয়ে থাকেন দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি।

ধৈর্যশীল রা শান্তিতে থাকে কেননা তারা জানে যে আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিবেন।
– মাওলানা তারিক জামিল দাঃ বাঃ

ধৈর্য ধরার পন্থা শিখানোঃ

- ❖ আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা।
- ❖ নফস কে নিয়ন্ত্রণ করা।
- ❖ মৃত্যুর কথা চিন্তা করা।
- ❖ কবরকে আপন ভাবা।
- ❖ তকদির যে লেখা হয়েছে তা সর্বদা মনে রাখা এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

দুনিয়াতে এই ধৈর্য ধারণ করা যেমন কষ্ট আল্লাহ্ তায়ালা এর পুরস্কারও দিয়ে থাকেন বেহিসাবে। সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে শুধু এগিয়ে গেলেই সব পাওয়া যায় না, প্রয়োজন ধৈর্য্যধারণ করা।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
"কেবলমাত্র ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় (পুরাপুরি) বেহিসাবে দেয়া হবে।" (সূরা যুমারঃ আয়াত-১০)

কাজঃ

- ⊙ ধৈর্য যে কতবড় নিয়ামত টা বুঝানো।
- ⊙ আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম যে সবর করা তার শিক্ষাদান।
- ⊙ ধৈর্য না ধরার ফল কেমন হতে পরে সেটা তুলে ধরা।
- ⊙ আল্লাহ্ সবর নামক পরীক্ষার দ্বারা বান্দাকে আরো উচুতে নিতে চায়, নবীগণের জীবনী থেকে শিক্ষাদান।

"ধৈর্য এমন একটি গাছ, যার সারা গায়ে কাটা কিন্তু ফল অতি সুস্বাদু"

১২. সঠিক পরিবেশের ব্যবস্থা করা

শিশুরা জান্নাতের ফুল। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আমাদের স্বপ্ন তাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। পারিবারিক শান্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিশুদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তাই শিশুদের মেধা বিকাশে ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবিধান খুবই জরুরি। যার শিশুকাল যতটা স্বযত্নে গড়ে উঠবে, তার জীবনের পরবর্তী জীবন ততই সুন্দর হবে। এজন্য ইসলামে মানবজীবনের শিশুকালের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিশুকে সর্বপ্রথম আল্লাহর তাওহিদ (একত্ববাদ)-এর শিক্ষা দিতে হবে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর অর্থ আর এর চেতনা তার মনে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আল্লাহর গুণাবলি ও মানুষের প্রতি তার নেয়ামতরাজির আলোচনা করে আল্লাহর সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে, আল্লাহ বান্দার সবকিছু দেখেন। তিনি বান্দাকে পর্যবেক্ষণ করেন। ফলে, বান্দা ভালো কাজ করলে তাকে আখেরাতে পুরস্কার দেবেন। খারাপ কাজ করলে শাস্তি দেবেন।

শিশুকে সচরিত্র শিক্ষা দিতে হবে। এর জন্য বাবা-মা সবচেয়ে বড় শিক্ষক। বাবা-মাকেই এজন্যই প্রথমে উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুকে প্রেম ও ভালোবাসা শেখাতে হবে। এজন্য বাবা-মা' র মন হতে কঠোরতা, শত্রুতার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। সবসময় সত্য কথা বলতে হবে। একজন শিশু যখন দেখবে, তার বাবা-মা সত্য কথা বলেন, তখন সে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং সততা শিখবে। শিশু কোনো ভালো কাজ করলে তাকে প্রশংসা করতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে।

শিশুকে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। নিজের সন্তানকেই সালাম দিতে হবে। তাদের সামনে মার্জিতভাবে কথা বলতে হবে। প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ভাব রাখতে হবে। এতে করে সন্তানের সামাজিক শিক্ষা হয়ে ওঠে।

শিশুদের জন্য খেলাধুলা আর বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তাদের শারীরিক গঠন সুন্দর হবে। শিশুদের সাঁতার, দৌড়সহ শারীরিক সক্ষমতা বাড়ে, এমন সব খেলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। পুষ্টিকর খাবার এবং মৌসুমি ফল খাওয়াতে হবে। ক্ষতিকর বিনোদন বা খেলাধুলা থেকে তাকে বিরত রাখতে হবে। প্রযুক্তির উন্নতির এ যুগে আপনার ছেলে কী খেলছে, কী করছে; সেটি দেখভাল করা আপনার কর্তব্য। মোবাইলে প্রচলিত যেসব গেমসের ব্যাপারে গবেষকরা সতর্ক করেছেন, সেগুলো থেকে শিশুদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে।

১৩. বই পড়ার অভ্যাস গঠন

বই পড়া একটি ভালো অভ্যাস এবং এর অনেক উপকারিতা আছে। বিশেষ করে নিয়মিত পড়ার অভ্যাস মানুষের চিন্তার গভীরতা বাড়ায় এবং বিস্তৃত করে কল্পনার জগৎ। আর যারা বই পড়তে ভালোবাসেন বছরে তাদের বেশিরভাগের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বই পড়ার লক্ষ্য থাকে। যদিও তা নির্ভর করে সময়ের ওপর।

তবে, একজন পাঠকের ক্ষেত্র বা আগ্রহ যাই হোক না কেন, তার একটি অভ্যাস করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি বই পড়াকে একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে চায়, তার জন্য কিছু ব্যবহারিক উপায় আছে।

পড়ার অভ্যাস তৈরি এবং তা জীবনযাপনের অংশ করে তুলতে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যটি হতে হবে স্পষ্ট এবং অবশ্যই তার একটি উদ্দেশ্য থাকবে।

পড়া নিয়ে পুরো বছরের লক্ষ্য নির্ধারণ হয়ে গেলে, এটির ব্যাকআপের জন্য একটি তালিকা প্রয়োজন।
একটি পড়ার প্যাটার্ন তৈরি করতে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠা পড়ার লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ১০-২০ পৃষ্ঠা পড়তে পারেন।

পড়ার জন্য মাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- অনেকে হার্ড কপি পড়তে পছন্দ করেন। তাদের জন্য পড়ায় মনোনিবেশ বাড়াতে আরামদায়ক টেবিল এবং চেয়ায়ের সঙ্গে দারুণ পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে সেই স্থানটিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন এবং একসময় সেই জায়গাটি হয়ে উঠবে আপনার প্রিয় স্থান।

সপ্তাহ/মাসের জন্য নির্ধারিত বই এবং আপনার বুকমার্ক করা অন্য কোনো নিবন্ধ পড়ার জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় আলাদা করে রাখুন।

প্রতিদিনের পাশাপাশি সপ্তাহের একটি দিনকেও বেছে নিতে পারেন। বিশেষ করে ছুটির দিন। সেদিন একটু বেশি সময় বই পড়ার জন্য বরাদ্দ রাখুন। পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে বিষয়টি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রতিদিন একই সময়ে বই পড়ুন। সেটা হতে পারে রাতে ঘুমানোর আগে অথবা দুপুরে বিশ্রামের সময়। ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত হবে বই পড়া।

বই পড়ার অভ্যাস রাতারাতি হবে না- এটা মনে রাখতে হবে। ধৈর্য্যহারা হলে চলবে না। হঠাৎ কোনও কারণে বই পড়তে ইচ্ছা না করলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

১৪. আত্মীয়তার সঠিক মূল্যবোধ

আত্মীয়তা! বর্তমান সমাজে শুধু নামেই আছে, কাজে আর নেই। কারণ পূর্বে আরব সমাজে আমরা গোত্র ভিত্তিক কি শক্তিশালী আত্মীয়তাই না দেখতে পাই, অথচ বর্তমানে বংশের নিদ্রিষ্ট কয়েকজন ছাড়া কাউকে চিনিই না আমরা। অথচ হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

"আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৬;]

পরবর্তী প্রজন্মকে মিশতে শিখাতে হবে, শ্রদ্ধাবোধের সৃষ্টি করতে হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন নিজেদের আরো মিলেমিশে চলার অভ্যাস করা। আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করা। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জিনিসও আমাদের স্নেহের বাচ্চারা লক্ষ্য করে, সেগুলো তারা অনুসরণ করে আমাদের অজান্তেই। আমাদের উচিৎ দেখা হলে সালাম দেওয়া, সুন্দরভাবে কুশল বিনিময় করা। এসব ছোটো ছোটো কাজের দ্বারাই পরবর্তী প্রজন্ম প্রভাবিত হবে।
হাদীসে এসেছে,

"অন্তত পক্ষে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো।"
বায্যার, হাদীস নং ১৮৭৭

আত্মীয়তা যে মুসলমানের উপর রহমতস্বরূপ সেটা আমরা উপলব্ধি করি না বলেই আমাদের অধঃপতন। দিনদিন আমরা খারাপ থেকে খারাপ অবস্থাতে পতিত হচ্ছি। অল্পতেই আমাদের মাঝে ডিপ্রেসন নামক কঠিন এক রোগ দেখা দিচ্ছে। অথচ আত্মীয়তা আমাদের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে দূরত্ব কমায়। আর এটাই তো কামিয়াবী। আর আত্মীয়তা থেকে দূরে সরলে যে আমরা আল্লাহর থেকেও দূরে সরাতে থাকলাম।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। [বুখারীঃ ৫৫২৯]

শুরু থেকেই এই শিক্ষা যদি না ঢুকাতে পারি আমাদের স্নেহের বাচ্চাদের মাঝে তবে পরবর্তী সময়ে আর তাদের মাঝে এই শিক্ষা প্রবেশ করানো যাবে না। তাই শুরু থেকেই তাদের মাঝে আত্মীয়তার বীজ বপন করে দিতে হবে।

পরবর্তী প্রজন্মকে ইসলামের সঠিক ধারণা দেওয়া জরুরি। যেমন, অনেকেই মনে করি, সদ্ব্যবহারের বিপরীতেই সদ্ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এর মাধ্যমে রক্ষার কি হলো আসলে। সমান সমানই তো হলো। এখানে কৃতিত্বের কিছু না। অপর পক্ষের বেঠিক আচরণের পরেও তার প্রতি সদয় থাকা, নিজ থেকে আত্মীয়তা ঠিক রাখাই তো আসল আত্মীয়তা রক্ষা করার নাম। এই শিক্ষা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকেই পাই,

“সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয় যে কোন প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে।” [বুখারীঃ ৫৫৩২]

এই শিক্ষাই তো ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে।

সর্বশেষে, আত্মীয়তার ছিন্নকারীর উপর যে কতবড় লানত পতিত হয় আর আখিরাতেও হবে সেবিষয়ে সঠিক শিক্ষাদান করতে হবে। এতো তাদের মাঝে উপলব্ধি হবে যে কতটা ভয়ঙ্কর পরিণতি একজন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারির জন্য। সূরা মুহম্মদে আল্লাহ্ বলেছেন,

“ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, ফলে তিনি তাদের বিধির করেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করেন।” (সূরা মুহাম্মদ)

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আত্মীয়তার মূল্যবোধ বুঝে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার পথের সঠিক রাস্তা দেখানোর দায়িত্ব আমাদেরই। তাই নির্দেশনা দেওয়ার কাজটা আমাদের সঠিকভাবে করার তৌফিক আল্লাহ্ দিক।

শিক্ষাঃ

- আত্মীয়তা যে কত মূল্যবান তার উপলব্ধি করানো।
- নিজেদের করার মাধ্যমে ছোটদের শিক্ষাদান করা।
- ছোটো-ছোটো কাজগুলোও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে হবে; যা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।
- আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম যে আত্মীয়তার মূল্যায়ন তা বুঝতে শিখবে।
- আত্মীয়তার অবমূল্যায়নের কুফল জানবে; আখিরাতেও যে এর কত খারাপ প্রভাব পড়বে টা জানতে পারবে।

১৫. পশ্চিমাদের সঠিক পরিচয় দান

ড. আহমদ আবদুল কাদেরঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতেই লোকেরা মনে করে এ সভ্যতা গণতন্ত্রের জন্মদাতা, মানবাধিকারের প্রবক্তা, সহনশীলতার লীলাকেন্দ্র আর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎগাতা। এ চিত্র মহৎ, সুন্দর। সাধারণত লোকেরা এটাই বিশ্বাস করে। আর পশ্চিমা পা-ত্য ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো এটাই আমাদেরকে শিখিয়েছে। প্রাচ্যের লোকেরা এটাই মেনে নিয়েছে। যা কিছু পাশ্চাত্যের তাই মানবিক, মহৎ আর বিজ্ঞানমন্মত। আর যা কিছু প্রাচ্যের, তা-ই কুসংস্কার, অমানবিক, সংকীর্ণতা এবং অবৈজ্ঞানিক। আমাদের মনমগজে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে।

নিঃসন্দেহে বর্তমানে পশ্চিমা জগতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর মানবাধিকার আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব চর্চা আছে। কিন্তু এটাই তার আসল রূপ নয়, তার ভিত্তিও নয়। পশ্চিমা সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রবল লোভ আর লালসার ওপর, ঘৃণা আর তীব্র বর্ণবাদী মানসিকতা আর গোটা পৃথিবীটাকে করায়ত্ত করার প্রবল আকাক্সক্ষার ওপর। আর নির্বিচারে মানুষকে হত্যা, খুন, অপহরণ আর অমানুষিক নির্যাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের সভ্যতা। ইতিহাস তার সাক্ষী।

তাদের অতীত চেহারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের কালো স্মৃতিতে। তাদের লোভী বর্ণবাদী মনের চাহিদা মেটাতে কত যে মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে তার কোন হিসাব নেই। বস্তুত এক কালো অন্ধকার ইতিহাস তাড়া করে ফিরে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে। যতই গণতন্ত্র আর মানবতার ফেরি করুক না কেন তার মসিলিপ্ত অতীতকে মুছা যাবে না, ভুলা যাবে না। ইতিহাস তার সমস্ত অমানবিক অপকর্মের সাক্ষী। কয়েকটি দেশের কিছু উদাহরণ তুলে ধরলেই তা সবার কাছে স্পষ্ট হবে।

১৪৯২ সালে স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা সর্বপ্রথম স্পেনের হাজার হাজার ইহুদী ও মুসলিমদেরকে জোর করে খ্রিস্টান বানানোর উদ্যোগ নেয়। তাদের স্পষ্ট নির্দেশ ছিলোঃ “হয় খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করো নতুবা স্পেন ছাড়ো।” তখন লক্ষ লক্ষ মুসলমান ও অনেক ইহুদী স্পেন ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা আশ্রয় নেয় মুসলিম শাসিত উত্তর আফ্রিকায়।

১৪১৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো বছর। উপনিবেশিক যুগের প্রথম দিকে তারা সারা দুনিয়ায় ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্ম প্রসার ও সবাইকে এ ধর্মে দীক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়ে অভিযান শুরু করে। তৎসঙ্গে তারা বিভিন্ন দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার পদক্ষেপ নেয়। অন্যদের জমি কেড়ে নেয়া, সমুদ্রে জলদস্যুতা করা, মানুষকে নির্বিচারে হত্যা-খুন করাসহ এমন কোন অপকর্ম নেই যে তারা করেনি। তাদের মুনাফার লোভ আর লালসার কাছে প্রায় ৫০ লাখ মানুষকে জীবন দিতে হলো।

তারাই প্রথম আফ্রিকা থেকে দাস ব্যবসার চালু করে। এর মাধ্যমে প্রায় ৫৫ লক্ষ আফ্রিকার মানুষকে আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাচার করে। তারা আমাদের দেশে দুর্ধর্ষ জলদস্যু হিসাবে পরিচিত।

১৬. পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে রক্ষা করা

ইসলামে রয়েছে একটি স্বচ্ছ সুন্দর ও সুস্থ সংস্কৃতি। যার অন্যতম লক্ষ হচ্ছে মানুষের জীবনকে সুন্দর করা, সুখ শান্তিময় ও কল্যানময় করা। বর্তমানে এক শ্রেনীর নাম মাত্র মুসলমান ইসলামের এই সুস্থ ও সুন্দর সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চাত্যের অশ্লীল, অশালীন ও নগ্ন অসংস্কৃতিক পিছনে পড়েছে যা নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত বিবেক বিবর্জিত। কেননা ইসলামী সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ, উন্নত, শালীন, মার্জিত, কল্যানকর ও মঙ্গলময়।

বিষয়টি বাস্তবভাবে বুঝার জন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলার ক্ষেত্রে পর পুরুষের সামনে সমস্ত শরীর ও নীচে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পোশাকে ঢেকে রাখা ফরজ ও অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। পুরুষরা পোশাকে প্রায় পুরো শরীর ঢেকে রাখে, আর মহিলারা আন্ডার ওয়্যারের উপর স্কার্ট পড়ে যা অনেক সময় হাফ প্যান্ট থেকেও খাটো হয়ে থাকে। তা পরে কারো সামনে বসলে উরুর অংশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের এহেন কুরুচিপূর্ণ পোশাক দেখলে যুবকদের তো বটেই বৃদ্ধদেরও যৌনউম্মাদনার সৃষ্টি হয়। ফলে যুব সমাজ ধর্ষন, ব্যাভিচার, এসিড নিক্ষেপ, নারী অপহরণ, প্রভৃতি অপরাধে জরিয়ে পড়ে।

ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত মিলন অবৈধ, তাই বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের জন্মের প্রশ্ন এখানে নেই এবং বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার খুবই কম বিধায় শিশুরা মাতা পিতার যৌথ ভালবাসায় বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। অধিকন্তু মহিলারা সন্তানদেরকে অনেক বেশী সময় দিতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ বহির্ভূত মিলন ও সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ না থাকায় এবং বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার খুব বেশী হওয়ায় মাতা পিতার ভালোবাসা খুব সন্তানের ভাগ্যেই জোটে। তাছাড়া পাশ্চাত্যবাসীরা নিজ শিশুদেরকে কোলে নেয়ার চেয়ে পোষা কুকুরকে কোলে নিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এভাবে শিশুরা অনাদারে অবহেলায় বেড়ে ওঠে।

একমাত্র বিবাহই ইসলামে নারী পুরুষের যৌন সম্ভোগ ও সন্তান লাভের বৈধ মাধ্যম। ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌনতা যেমন, লিভ টুগেদার, সমকামিতা, পশু মৈথুন ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও মারাত্নক মহাপাপ। শুধু তাই নয়, বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌনতা রোধের পদক্ষেপ হিসেবে ইসলাম বেগানা নারী-পুরুষের মাঝে পর্দার বিধানকে ফরজ ও আবশ্যকীয় করেছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, যৌনতার আবর্তেই পাশ্চাত্য সমাজ ঘুরপাকখাচ্ছে। ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহু খৃষ্টান দেশে যৌনরাজ্যের যে ভীতিপ্রদ চিত্র ভেসে উঠেছে, তা যে কোন শান্তি প্রিয় মানুষকে সন্দেহাতীতভাবে ভাবিয়ে তোলে। পুরুষ সমকামিতা নারী সমকামিতা অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা মেয়ের যৌন সম্পর্ক বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মেয়ের পরকিয়া,

অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার একত্রে বসবাস প্রভৃতি আজ মার্কিন মুল্লুক, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বহুদেশে অপরাধ বলে বিবেচিত নয়। এছাড়া পশু মৈথুন মত জঘন্য যৌনতার চর্চাও আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অবারিত। এভাবে করে পিতৃ পরিচয়হীন অবৈধ জারয সন্তানে ভরে উঠেছে পাশ্চাত্য দেশগুলো। সেখানে বিবাহ ও পরিবার প্রথা দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

শিক্ষাঃ

- ⊙ পরবর্তী প্রজন্মের সামনে পশ্চিমাদের সত্যরূপ দেখানো।
- ⊙ পশ্চিমা সভ্যতা বলতে যে সংস্কৃতি বুঝানো হয় তা আসলে অসভ্য সমাজের চিত্র। এ থেকে একজন মুসলিম অনুপ্রাণিত হতে পারে না।
- ⊙ পশ্চিমা সমাজের উপরে উপরেই চাকচিক্য, একটু ভিতরে নাড়া দিলেই দেখা যায় কি বেহাল দশা।
- ⊙ বর্বর সমাজের দিকে দিনকে দিন ধাবিত যে সমাজ, সেটা থেকে নিজেরা দূরে থাকা চাই।

১৭. দ্বীনের সাথে নো কম্প্রোমাইজ

দ্বীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা একজন মুমিনের আবশ্যকীয় বিষয়। দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও নিজেকে দ্বিনের ওপর অবিচল রাখা কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন।

আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।' (সুরাঃ আশ শুরা, আয়াতঃ ৪২)
যারা দ্বিনের ওপর অবিচল থাকবে, তাদের ব্যাপারে আছে সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে নাজিল হয় ফেরেশতা (এ বলে) যে তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দিত হও।' (সুরাঃ ফুসসিলাত, আয়াতঃ ৩০)

এক. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর কাছে অধিক হারে দোয়া করা, যেন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিনের ওপর অবিচল রাখেন।

রাসুল (সা.) আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন। কারণ মানুষের মন সর্বদা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এই দোয়া বেশি পাঠ করতেন, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত (দৃঢ়) রাখো।
(তিরমিজি, হাদিসঃ ২১৪০)
দুই. অধিক হারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইস্তিগফার পড়া। কারণ ক্ষমা প্রার্থনার কারণে তার জন্য দ্বিনের ওপর অটল থাকা সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো।

তাহলে তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্কৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন।' (সুরাঃ হুদ, আয়াতঃ ৩)
তিন. ইলমে নাফে তথা উপকারী ইলম অর্জনের চেষ্টা করা। কারণ উপকারী ইলম অর্জনকারীর জন্য তা আলো ও পথ প্রদর্শক। কোনো বান্দা ইলম ছাড়া সঠিক রাস্তায় চলতে পারবে না। ইলম তাকে সত্য-মিথ্যার পথ বলে দেবে। ভালো-মন্দের পথ দেখাবে। রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছে এই দোয়া করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অনুপকারী বিদ্যা থেকে; এমন অন্তর থেকে, যে অন্তর (আল্লাহকে) ভয় করে না এবং এমন থেকে, যা কবুল হয় না আর ওই প্রবৃত্তি থেকে, যা তৃপ্ত হয় না। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি এই চার বস্তু থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (নাসায়ি, হাদিসঃ ৫৪৭০)

চার. ভালো লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা। এই সাহচর্য আপনাকে ভালো-মন্দের পথ দেখাবে। যদি ভালো লোকের সাহচর্য গ্রহণ করেন, তাহলে দ্বিনের ওপর অবিচল থাকা সহজ হবে। হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের সবার খেয়াল রাখা উচিত, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৭৮)

পাঁচ. অশ্লীল গান-বাদ্য শোনা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এটি একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি। কারণ গান-বাদ্য মানুষের দিলকে নষ্ট করে দেয় আর তখন সে ভালো জিনিস বা ভালো পথে চলতে পারে না। যদি কারো মধ্যে এই মন্দ অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে এক সপ্তাহের জন্য পরীক্ষা করে দেখুন আপনার মধ্যে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয়।' (সুরা: লুকমান, আয়াত: ৬)

বেশির ভাগ সাহাবি, তাবেয়ি ও তফসিরবিদের মতে, 'লাহওয়াল হাদিস' মানে গান।

ছয়. নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করা। কারণ কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, যার হৃদয়ে কোরআনের কিছুই নেই, সে বর্জিত ঘরের মতো। (তিরমিজি, হাদিস: ২৯১৩)

সাত. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্বসহ আদায় করা। কারণ নামাজ মানুষকে সব অনিষ্টতা থেকে দূরে রাখে এবং দ্বিনের ওপর অটল থাকা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো।' (সুরা: আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

১৮. পারিবারিক তালিম

আদর্শ পরিবারের হাতেই রয়েছে শিশুদের তা ‘লীম-তরবিয়তের সর্বাধিক ক্ষমতা ও শক্তি। এজন্য শিশুদের তা ‘লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে পরিবারকে শিশুদের চোখে আয়না বা রঙ্গিন চশমার সাথে তুলনা করা হয়। রঙ্গিন চশমা যেমন চোখে লাগালে, প্রকৃতির দৃশ্যও রঙ্গিন দেখায় তেমনিভাবে পরিবার তার সন্তানকে যা বুঝাবে, যা শিক্ষা দিবে, তাই বুঝবে ও শিখবে। শিশু কি দেখল অথবা কি শুনল সেটি বড় কথা নয়, বরং শিশুদের ক্ষেত্রে বড় কথা হচ্ছে শিশুদের কি বুঝানো হচ্ছে। এজন্য দেখা যায়, একই প্রতিষ্ঠানের একই সিলেবাস একই শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্র ও শিশুগুলো ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হয়ে থাকে। অথচ কথা ছিল একই প্রকৃতি একই স্বভাবের হওয়ার। কিন্তু তারপরও ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হওয়ার কারণ হচ্ছে পারিবারিক প্রভাব এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী পরিবেশের প্রভাব। এজন্য শিশুদের আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক গঠনের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায় বাবা-মা ও অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

তালিমের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে। আর তরবিয়তের মাধ্যমে মানুষ মানার যোগ্যতা অর্জন করে। কোরআনুল কারিমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের তিনটি মৌলিক কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো কোরআনের তেলাওয়াত, কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা এবং আত্মশুদ্ধি করানো।

তিনি আরো বলেন, পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শেখানোর চেয়ে বড় কোনো অনুগ্রহ করতে পারে না। (তিরমিযি, হাদিস নম্বর- ১৯৫২)। হজরত জাবির ইবনে সামুরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো লোক তার সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া প্রতিদিন এক সা’ (সাদকাতুল ফিতর সমপরিমাণ) গম সদকা করার চেয়ে উত্তম। (মুসনাদে বাযযার ৪২৭৪)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সর্ববিষয়ের আদব শিক্ষা দিতেন। এমনকি পানাহারের আদবও শেখাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৎছেলে ওমর ইবনে আবু সালামা খানা খাচ্ছিলো। খাবারের সময় পাত্রের এদিক ওদিক হাত নাড়াচাড়া করছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে খাও, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনে থেকে খাও। (বুখারি- হাদিস নম্বর- ৫৩৭৬)।

আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে শৈশব থেকেই সন্তানকে তালিম দেওয়া মা-বাবার দায়িত্ব। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সর্বস্তরে নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সাত বছর বয়স থেকেই সন্তানকে নামাজে অভ্যস্ত করে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল (সা.)। ইরশাদ হচ্ছে, ‘সাত বছর বয়সে তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাজের নির্দেশ দাও। বয়স ১০ বছর হওয়ার পর (প্রয়োজনে) নামাজের জন্য তাদের শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।’ (আবুদাউদ, হাদিসঃ ৪৯৫)

কতিপয় পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে তালিমে আগ্রহী করতেঃ

- ৬ পারিবারিক গ্রন্থাগার।
- ৬ ওয়াল পোস্টারে বিভিন্ন ইসলামী বিয়য়।
- ৬ পারিবারিক নিয়মিত তালিম।
- ৬ পারিবারিক ইসলামী প্রতিযোগিতা।
- ৬ ঘরোয়া ইসলাহি মাহফিল।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ‘যে বড় ব্যক্তির অধীনে কোনো ছোট মানুষ থাকে, হোক সে মালিকানাধীন দাস বা এতিম অথবা নিজের সন্তান এবং সে যদি ছোটকে নামাজের নির্দেশ না দেয়, তবে তাকে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা সে আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হয়েছে।’ (আল-ফাতাওয়াল কুবরাঃ ২/৩২)

১৯. সঠিক মোহবতদান

সূরা ফুরকানে আল্লাহ বলেছেন,
وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿۲۷﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿۲۸﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا

‘জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, আফসোস! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে পথ ধরতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করেছিল! শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগ করেই থাকে।’ -সূরা ফুরকান ২৭-২৯

জ্ঞান অর্জনের জন্যে আমরা এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করি। ইন্টারনেট থেকে শায়েখদের বই পড়ি এবং লেকচার শুনি। কিন্তু ইন্টারনেটে যে জিনিসটির অভাব তার নাম মোহবত।

মোহবত মানে কারো সামনে গিয়ে তার কথা শুনে কিছু শেখা নয়, মোহবত মানে কারো আচরণ দেখে কিছু শেখা। অর্থাৎ, যে কথা বলা যায় না, বা লিখা যায় না, কিন্তু ব্যক্তির আচরণে প্রকাশ পায়, এমন কিছু শেখাকে মোহবত বলে।

একজন শিক্ষক যখন ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তখন সেটাকে মোহবত বলা যায় না। মোহবত হলো সেটাই, যেখানে শব্দ ও অক্ষরে সাহায্য ছাড়াই শেখা যায়।

মোহবতের গুরুত্ব অত্যধিক হলেও ইন্টারনেটে তা পাওয়া যায় না। এর ফলে অনেক মিথ্যা জ্ঞান আমরা শিখে ফেলি। যেমন, একজন শায়েখ তাঁর বক্তব্যে মিথ্যা বলতে পারেন, কিংবা তাঁর লেখায় মিথ্যা লিখতে পারেন, এটা সহজ। কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন আচরণে মিথ্যা অভিনয় করে যাওয়াটা খুবই কঠিন। একজন মানুষের ওয়াজ শুনে তাকে ফেরেশতা মনে হলেও তার সাথে মোহবত দিতে গেলে দেখবেন সে শয়তানের বড় ভাই। সুতরাং মোহবত ছাড়া কোনো জ্ঞান-ই পূর্ণাঙ্গ হয় না।

বর্তমানে শিক্ষার প্রসার যত বেশি হচ্ছে, মানুষের দৃষ্টিও তত খুলে যাচ্ছে এবং সবাই শান্তির পরিবর্তে হতাশা ও বিস্ময় এবং আনন্দের পরিবর্তে দুঃখ ও নিরানন্দ প্রত্যক্ষ করছে। আর এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তাহলে কাঁদতে বেশি, হাসতে কম।’

একটু চিন্তা করুন, যদি কোনো এক দুর্বল বৃদ্ধের সুস্থ ও সুঠাম দেহের যুবক সন্তান থাকে, নাতি-পুতি ইত্যাদি থাকে, তাহলে লোকে তাকে দেখে কেমন ঈর্ষা করবে? বলবে, কী সৌভাগ্য তার। আল্লাহ তাকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি নিজেও আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। কেননা যে যে বাগান করেছে, তা আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত।
কিন্তু ওই ব্যক্তি তখনই প্রচণ্ড আঘাত পাবে, যখন দেখবে তার অন্তিমকালে তাকে এক ফোঁটা পানি এগিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে কাছে দেখবে না। আমাদের অবস্থা বৃদ্ধের এই সন্তানদের মতো।

ইসলাম আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আফসোস করে বলছে, এত লোকের (আলেমের) মধ্যে যদি সামান্য কয়েকজন কাজের হতো, তাহলে সেই অল্পসংখ্যকই না কত ভালো ছিল। ইসলাম বলছে, সবাই আমার নামে মানুষকে আহ্বান করছে, কিন্তু তাদের কাজ একনিষ্ঠভাবে। ইসলামের জন্য সামান্যই হচ্ছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে মানুষের ভবিষ্যতের বিষয় অজানা এবং তাদের দোষ সম্পূর্ণ গোপন।
মানুষ যদি অন্তর্দৃষ্টি পেত, তাহলে দেখতে পেত যে পৃথিবীটা দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, কলুষতা আর পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে গেছে। সবাই জাঁকজমক ও ঝলমলে পোশাক পরে হিংস্র পশুর মতো বিচরণ করছে।
আলেমদের অন্তর্দৃষ্টি খোলা ও ইসলামের জন্য নিবেদিত হওয়ার পথে বুজুর্গদের মোহবত তথা সংস্রবের কোনো বিকল্প নেই। যদি এর কোনো বিকল্প থাকত, তাহলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবি বলা হতো না। তাঁদের আউলিয়া, সুফি বা অন্য কোনো পদবিতে ভূষিত করা হতো।

তাবেয়িদের অনেকে জিকির, তাসবিহ ও নফল ইবাদতে খুব অগ্রগামী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা মর্যাদায় সাহাবিদের সমতায় পৌঁছতে পারেননি। মোহবতের দ্বারা কয়েক মুহূর্তের যে কাজ হয়, তা প্রখর মেধা, একনিষ্ঠ অধ্যয়নেও হয় না।

মোহবতে হৃদয়ে আকুলতা-ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, অন্তর নুরে উদ্ভাসিত হয়। সব কিছুতে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা কোনো জিনিসের গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়–যা কিতাবপত্রেও পাওয়া যায় না, বিদ্যার্জনের মাধ্যমেও আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এটা যেন একটা প্রদীপ। প্রদীপ থেকে প্রদীপে যেমন আলো সঞ্চারিত হয়, তেমনি হৃদয় থেকে হৃদয়ে আলোর গতি সঞ্চালন হয়। বুজুর্গ ব্যক্তিদের কাছে উপস্থিত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে মানুষ নিজেদের তুচ্ছ মনে করতে শেখে এবং অনুশোচনার সুযোগ পায়, বুজুর্গদের দরবারে গিয়ে নিজেদের অবস্থা দেখে লজ্জিত হয়। তাদের চরিত্র মাধুর্য, ইবাদত, রুহানিয়্যাত দেখে নিজেদের দোষত্রুটি ও ঘাটতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। নেক মানুষের সাহচর্যে থাকার বিষয়টা তো সরাসরি ওহির দ্বারা প্রমাণিত।

২০. শিশুর সাথে বন্ধুসুলভ হওয়া

শিশুর মেধা বিকাশে ও সৃষ্টিশীল বোধ তৈরিতে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবার মতো শিক্ষকরাও অবদান রাখেন। বরং তাদের অবদান কোনো অংশে কম নয়। শিক্ষকদের যত্নশীল আচরণ শিশুর মেধা-মনন স্বচ্ছ করে। তাদের অভিভাবকসুলভ ব্যবহার সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিক চিন্তা-চেতনা তৈরিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শরিয়তের সবরকম দায়ভার থেকে শিশুরা মুক্ত। কোনো বিষয়ে জবাবদিহি করতে তারা বাধ্য নয়। পাশাপাশি তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বলও বটে। তাই শিশুদের প্রতি সবসময় আচরণ হওয়া উচিত কোমল ও বিনম্র। এটি আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সুন্নতও। তিনি সবার সঙ্গে নম্র ও কোমল আচরণ করতেন।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসুল (সা.) ছোট-বড় সবার সঙ্গে নম্র ও কোমল ব্যবহার করতেন। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন–

আল্লাহ তাআলা আমাকে হঠকারী ও কঠোরতাকারী হিসেবে পাঠাননিঃ বরং সহজ-কোমল আচরণকারী শিক্ষকরূপে পাঠিয়েছেন।
(মুসলিম, হাদিসঃ ১৪৭৮)

শিশুদের ভুলত্রুটি মধুর শাসনে সংশোধন করতে হয়। তাদের শিক্ষাদানে শিশুতোষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। পাঠদানে চিন্তাশীল ও সতর্ক হতে হয়। তাদের মনোযোগিতা তৈরিতে কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কোমল আচরণকারী, তিনি সর্বক্ষেত্রে কোমলতাকে ভালোবাসেন।' (বুখারি, হাদিসঃ ৬০২৪)

শিশুর প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের তাগিদ দিয়ে মহানবী (সাঃ) আরও বলেছেন, 'শিশুদের প্রতি স্নেহ ও আদর দেখায় না, এমন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করা উচিত'। ওলামায়ে কেরাম বলেন, ছোটদের প্রতি দুর্ব্যবহার কবিরা গুনাহের সমপর্যায়ের। তাই আল্লাহর করুণা লাভ করতে ছোটদের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ আবশ্যক।
আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার রাসুল (সাঃ) নিজ নাতি হাসান (রা.)-কে চুমু খেলেন। সে সময় তার কাছে আকরা বিন হারেস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি দশ সন্তানের জনক। কিন্তু আমি কখনও তাদের আদর করে চুমু খাইনি। তখন মহানবী (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না'। (বোখারি, হাদিস নংঃ ৫৬৫১)

বিশ্বনবী হয়েও তিনি শত ব্যস্ততার মাঝে শিশুদের খোঁজখবর নিতেন। এটি তার অনুপম ও সুমহান চরিত্রের দ্যুতিময় দৃষ্টান্ত। শিশুর প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার কারণে শিশুরাও মহানবী (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন কোনো সফর শেষে বাড়িতে ফিরতেন, তখন বাচ্চারা তার আগমনের পথে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাত। একবার তিনি তার সফর থেকে এসে আমাকে তার বাহনের সামনে বসালেন। অতঃপর নাতি হাসান, হোসেন (রা.)-কে বাহনের পেছনে বসালেন। তারপর আমাদের নিয়ে তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন। (মুসলিম, হাদিস নংঃ ৬৪২১)

তাই আসুন, শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসপূর্ণ আচরণে সচেষ্ট হই। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি পালন করে পার্থিব শান্তি লাভ করি এবং আখেরাতে বিপুল সওয়াব লাভে ধন্য হই। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

রেফারেন্স (অধ্যায়ানুসারে)

১.-

২.

https://www.muslimmedia.info/2019/07/03/instill-love-for-quran-in-childs-heart

https://www.jagonews24.com/amp/710295

https://islamibarta.com/public/article/family&life/2911

৩.

https://avijatrik.com

৪.

https://www.google.com/amp/s/islamhouse.com/read/amp/bn

https://www.google.com/amp/s/www.bd-pratidin.com/amp/islam/2020/

৫.

https://www.jugantor.com/islam-life/

https://www.onp24.com/islam/news/19244

https://www.daily-bangladesh.com/religion/91951

https://www.ourislam24.com/2018/

৬.

https://www.alkawsar.com/bn/article/695/

https://www.kalerkantho.com/online/lifestyle/2018/01/14/589327

https://www.banglanews24.com/cat/news/bd/73732.details

https://www.google.com/amp/s/www.jagonews24.com/amp/447455

https://blog.jit.com.bd/fresh-mind-tips-1467

৭.

https://blog.jit.com.bd/fresh-mind-tips-1467

https://www.banglanews24.com/cat/news/bd/73732.details

https://www.kalerkantho.com/online/lifestyle/2018/01/14/589327

৮.

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/bengali/news-55623962.amp

https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2023/06/11/1288640

https://www.jugantor.com/todays-paper/it-world/25887/

৯.

https://bangla.thedailystar.net/life-living/news-513471

https://www.google.com/amp/s/www.prothomalo.com/amp/story/lifestyle/

https://www.google.com/amp/s/bangla.bdnews24.com/amp/story/lifestyle%252Farticle1421722.bdnews

১০.

https://www.islamiainobichar.com/index.php/iab/article/view/15

https://barta24.com/details/islam/148991

https://m.dailyinqilab.com/article/170302/
https://alihasanosama.com/book-review-2/
১১. -
১২.
https://www.google.com/amp/s/www.prothomalo.com/amp/story/religion/
https://www.jugantor.com/todays-paper/features/islam-and-life/432927/
১৩.
https://bangla.thedailystar.net/
https://m.dailyinqilab.com/article/458924/
https://www.google.com/amp/s/www.banglatribune.com/amp/lifestyle/811382/
১৫ ও ১৬.
https://m.dailyinqilab.com/article/71047
http://imam.gov.bd/singlepost/5545
১৭.
https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/11/15/1092257\
১৮.
https://www.google.com/amp/s/www.deshrupantor.com
https://www.faridpur-protidin.com
https://www.hadithbd.com/books/email/?id=9502
https://www.alkawsar.com/bn/article/2339/
১৯.
https://jobayerbd.wordpress.com/
https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/01/15/1110899
https://m.dailyinqilab.com/article/70492/
২০.
https://www.google.com/amp/s/www.dhakapost.com/amp/religion/16277
https://banglanews24.com/index.php/islam/news/bd/706702.details